بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুমআ

"জামাতে এমন সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের সমাগম হওয়া চাই যাদের অনুভূতি ইন্দ্রিয় এমনটি হবে যে তারা আধ্যাত্মিক প্রভাবকে অধিক হতে অধিকতর গ্রহণকারী হবেন এবং এরপর বিশ্বকে প্রকৃত নামাজ কি এবং প্রকৃত ইবাদত কি জিনিস তা অভিহিতকারী হবেন এজন্য কি ধরনের ইন্দ্রিয় সৃষ্টি করার প্রয়োজন।"

সৈয়দনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডন হতে প্রদত্ত ২৯শে জানুয়ারী, ২০১৬-এর জুমআর খুতবার কিয়দংশ

তাশাহুদ, তাউজ ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) বলেন - হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এক স্থানে বর্ণনা করেন যে,- আল্লাহতাআলা অদৃশ্য বা গুপ্ত, কিন্তু তিনি স্বীয় ক্ষমতাশক্তির দ্বারা চিহ্নিত হন। দোওয়ার দ্বারা তাঁর সত্তাকে বা তাঁর অস্তিত্বকে অনুভব করা যায়। তিনি বলেন,- কেউ বাদশাহ বা সম্রাট আখ্যায়িত হোক না কেন, প্রত্যেকের উপর অবশ্যই সংকটময় পরিস্থিতি আসে যখন মানুষ সম্পূর্ণরূপে অসহায় হয়ে পড়ে এবং বুঝে উঠতে পারে না যে এখন তার কি করা উচিৎ। সেই কঠিন পরিস্থিতিতে দোওয়ার মাধ্যমে সমস্যাবলীর সমাধান সম্ভব হয়।

বহু স্থানে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বিভিন্ন পন্থায় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর সাহাবারা এ সম্পর্কে এমন জ্ঞান অর্জন করেন এবং তাঁর (আঃ) এর সাহচর্য্যের দরুণ তাঁদের দোওয়ার উপর এমন দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় এবং এমন দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে অপরের উপরও তার প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল এবং অমুসলিমরাও যারা আহমদীদের সহিত সম্পর্ক রাখতেন জানতেন যে, এঁর দোওয়াসমূহ গৃহীত হয়ে থাকে। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর খিদমতে একটি ঘটনা শোনানো হয় যাতে তিনি খুব হাঁসেন। হযরত মুনসি আড়োড়ে খান সাহেব এর ঘটনা সেটি। হযরত মুনসি সাহেব প্রথম দিকে ঘন ঘন কাদিয়ানে আসতেন। একবার তিনি ম্যাজিস্ট্রেটকে বলেন,- আমি কাদিয়ান যেতে চাই তাই আমাকে অবসর দিন। ম্যাজিস্ট্রেট তা শুনে অসম্মতি জানায়। মুনসি সাহেব বলেন,- খুব ভালো। আজ থেকে আমি অভিশাপে রত হয়ে যাচ্ছি। অবশেষে সেই ম্যাজিস্ট্রেটের এমন একটি ক্ষতিসাধিত হোল যে তিনি অতিশয় ভীত হয়ে পড়ল এবং পরবর্তীতে এমন প্রভাব সেই ম্যাজিস্ট্রেটের উপর পড়ল যে যখনই শনিবার আসতো তিনি আদালতের কর্মচারীদের বলতেন যে, আজ একটু শীঘ্র কাজ গুটিয়ে নাও। এভাবে যখনই মুনসি সাহেব কাদিয়ান যাওয়ার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করতেন সেই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব স্বয়ং তাঁকে অবসর প্রদান করতেন। তো এমন ভীতত্রস্ত হলেন তিনি তাঁর দোওয়ার নামে। তাই এই সমস্ত মানুষ ছিলেন যাঁরা নিজের পুণ্যকর্মের এবং দোওয়ার প্রভাব-প্রতিপত্তি অপরের উপরও ফেলেছিলেন এবং এই বিষয়গুলিই আমাদেরকে আজ সম্মুখে রাখা প্রয়োজন এবং আল্লাহতাআলার সহিত সম্পর্কতে অগ্রগণ্য হওয়া উচিৎ।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর প্রেক্ষাপটে কিছু আরও ঘটনা বর্ণনা করছি যা হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, এবং এটি আমাদের আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি ও তরবীয়তের জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীতে নানান মেজাজের ও অনুভূতিসম্পন্ন মানুষ হয়ে থাকে, কতক লোকের ইন্দ্রিয় তীব্র বা প্রখর হয়ে থাকে আবার কতকের মৃদু বা দুর্বল। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) এই অনুভূতি শক্তির পার্থক্যকে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর প্রেক্ষাপটে একটি পার্থিব দৃষ্টান্ত দেন। তিনি বলেন যে,- হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলতেন যে,- কোন এক শহরে কিছু লোক পরস্পর আলোচনা করছিল যে, 'তিল' অনেক গরম হয়। এটি হতেই পারে না যে কেউ আড়াইশত গ্রাম তিল খেয়ে অসুস্থ না হয়। এই কথোপকথনের মাঝে একজন বলল যে, যদি কেউ এত পরিমাণ তিল খেতে পারবে তাহলে তাকে পাঁচ টাকা পুরস্কার দেব। এক জমিদার সেখান হতে যাচ্ছিল ছিল, সে এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করল যে, ডালসমেত খেতে হবে, না ডাল ছাড়া। এবার দেখুন যে এই দুই প্রকৃতির অনুভূতিসম্পন্ন মানুষের মধ্যে কত প্রভেদ। একপ্রকার মানুষ তো তারা যারা আড়াইশত তিল খাওয়া অসম্ভব মনে করছে এবং অপর প্রকৃতির মানুষ তারা যারা ডাল সমেত খেতে প্রস্তুত।

সুতরাং পৃথিবীতে যেরূপ অনুভবের পার্থক্য বিদ্যমান ঠিক সেরূপ আইন আধ্যাত্মিক জগতেও প্রযোজ্য যে কার ও উপর নামাজ বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে আর কারও উপর কম। কিছু এমন আছে যারা কেবল নামাজ পড়ে এবং কেবল বাহ্যিক নামাজ পাঠ করে মাথা মাটিতে স্পর্শ করে নেয় এবং কোন প্রভাবই পড়ে না তাদের উপর। আধ্যাত্মিক অনুভূতির প্রমাণ এর জন্য তাদেরই সাক্ষ্য গৃহীত হবে যাদের উপর এর প্রভাব অধিক, যাদের উপর প্রভাব বেশী হয়ে থাকে, যারা ইবাদত করেন এবং ইবাদতের প্রতিফলন তাদের উপর পড়ে। অতএব জামাতে এমন সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের সমাগম হওয়া চাই যাদের অনুভূতির ইন্দ্রিয় এমনটি হবে যে তারা আধ্যাত্মিক প্রভাবকে অধিক হতে অধিকতর গ্রহণকারী হবেন এবং এরপর বিশ্বকে প্রকৃত নামাজ কি এবং প্রকৃত ইবাদত কি জিনিস তা অভিহিতকারী হবেন এজন্য কি ধরনের ইন্দ্রিয় সৃষ্টি করার প্রয়োজন। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)

একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যা হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রাঃ) বলতেন যে,- এক ধর্মীয় নেতা মৌলভী খান মালিক সাহেব যিনি আরবী ব্যাকরণে জ্ঞানী ছিলেন। তিনি কোথাও হতে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর দাবী সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে কাদিয়ানে আগমন করেন এবং তাঁর (আঃ) এর কথা শুনে ঈমান আনয়ন করেন। প্রত্যাবর্তনকালে যখন তিনি লাহোর পৌঁছান তখন সংকল্প করেন মৌলভী গোলাম আহমদ সাহেব যিনি শাহী বা রাজকীয় মসজিদে দরস দিতেন আর তিনি একসময় তাঁর শিষ্যও ছিলেন সাক্ষাৎ করা যাক। মৌলভী গোলাম আহমদ সাহেব মৌলভী খান মালিক সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন যে,- বলুন কোথা হতে আসছেন? তিনি বলেন কাদিয়ান থেকে। তিনি হতবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেন যে কাদিয়ান হতে? তিনি পুনরায় বলেন,-হ্যাঁ, কাদিয়ান হতে। তখন তিনি বলেন,- কেন? তিনি বলেন,- মির্যা সাহেবের শিষ্যত্ব বরণ করতে গিয়েছিলাম। তিনি উত্তরে বলেন যে,- আপনি এত বড় ধর্মগুরু হয়ে তার মধ্যে এমন কি প্রশংসনীয় জিনিস দেখলেন যে তার শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য চলে গেলেন। মৌলভী খান মালিক সাহেব পাঞ্জাবী ভাষায় তাকে উত্তর দেন যে,-'তুমি নিজের কর্ম কর, এসব বিষয় তোমার বোধগম্য হবে না।' অতএব এমন পুণ্য প্রকৃতির মানুষও ছিলেন যারা যেতেন এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর বয়াতের অন্তর্ভূক্তও হতেন। জ্ঞানের কোন অহংকারবোধ তাদের ছিল না। এভাবে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর যুগে এক আরব ব্যক্তি এল। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) কিছু লোককে নির্দিষ্ট করেছিলেন তাঁকে তবলীগ করতে। কয়েকদিন তার সহিত কথোপকথন হতে থাকে কিন্তু কোন প্রভাব পড়ল না। শেষে তবলীগকারীরা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)কে বলেন,- এই লোকটি বড়ই আবেগপ্রবণ বা উদ্দিপনাসম্পন্ন ব্যক্তি, লোকটি অন্যান্য অন্বেষণকারীর মত নন। সত্যের সন্ধানী বলে মনে হয়। তিনি (আঃ) দোয়া করেন এবং তাঁকে জানানো হয় যে, এই ব্যক্তির হেদায়াত অর্জন হবে। খোদাতাআলার কুদরত সেই রাত্রেই কোন কথায় এমন প্রভাব হোল যে প্রভাতে সেই ব্যক্তি বয়াত গ্রহণ করেন এবং প্রস্থান করেন। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন যে,- হজ্জের সময় বহু দলকে সেই ব্যক্তি তবলীগ করে। একটি দল তাকে প্রচন্ড মারধোর করে অজ্ঞান করে দিত, জ্ঞান ফিরে আসলেই তিনি অন্য দলের নিকট গিয়ে তাদের তবলীগ করা আরম্ভ করে দিতেন। তাই বিষয় এটি যে আল্লাহ তাআলা যখন হৃদয় উন্মুক্ত করেন তখনই তা উন্মোচিত হয় এবং এমন অনুকরণীয় প্রেরণা সৃষ্টি হয় যে কোন কিছুরই ভ্রুক্ষেপ করে না তারা।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) শিশুদের সহিত কিরূপ সম্পর্ক রাখতেন এবং তরবীয়তের প্রতি কিভাবে যত্নবান ছিলেন সে সম্পর্কে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন যে,- তরবীয়তের সঠিক পন্থা বা রীতি হোল খেলাধুলার মাধ্যমে শিক্ষা পাওয়া। অর্থাৎ খেলা ধুলার মাঝেই তাদের তরবীয়ত হয়ে যাওয়া। সর্বপ্রথম যখন শিশু অবস্থায় থাকে তখন গল্প-কাহিনীর মাধ্যমে তাদের তরবীয়ত হওয়া উচিৎ। বড়দের জন্য তো ধর্মোপদেশ বক্তৃতাই যথেষ্ট। কিন্তু শৈশবে উৎসাহ বা কৌতুহল সৃষ্টির জন্য গল্প জরুরী হয়ে পড়ে। কাহিনীগুলি মিথ্যা হওয়া আবশ্যক নয়। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) আমাদের কাহিনী শুনাতেন কখনো হযরত ইউসুফ এর গল্প শোনাতেন, কখনো হযরত নূহ এর আবার কখনো হযরত মুসার ঘটনা শোনাতেন কিন্তু আমাদের জন্য সে সমস্ত গল্পই মনে হোত অথচ সেগুলি ছিল সত্য ঘটনা। সুতরাং শৈশবের শিক্ষার জন্য উত্তম পন্থা বা উপায় হোল গল্প-কাহিনী। যদিও কিছু কাহিনী নিরর্থক এবং অশোভনীয় হয়ে থাকে কিন্তু কল্যাণকর বা চারিত্রিক শক্তিকে দৃঢ়কারী এবং জ্ঞানগর্ভ বা শিক্ষামূলক কাহিনীও থাকে। এবং বাচ্চার বয়স যখন খুব কম থাকে তখন সেই পদ্ধতিতেই শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। আবার যখন সে অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে ওঠে তখন তার জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সর্বোৎকৃষ্ট বস্তুগুলি উন্মোচিত হয়। কিছু মাতা-পিতা এমনও আসেন (আমার নিকট) যে বাচ্চা ভীষণ খেলাপ্রিয়। যদি টি.ভি গেম ইত্যাদিতে খেলা না করে এবং বাহিরে গিয়ে খেলা করে থাকে তবে তাকে খেলতে দেওয়া উচিৎ। পুস্তকের সহিত যে সমস্ত বিষয়ের উপর শিক্ষা প্রদান করা হয়ে থাকে সেগুলি খেলার মাধ্যমে কার্যতঃ শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু গল্প কাহিনীর যুগ খেলার যুগ হতে প্রাচীণকালীণ।

তাই পিতাদের উচিৎ শিশুদের জন্য সময় বার করা। যদি পিতা-মাতা উভয়ে একত্রে বাচ্চাদের তরবীয়তের উপর জোর দেন, তাদের সহিত বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেন, তাদের উত্তম তরবীয়ত করেন, তাদেরকে নিজেদের সাথে সংযুক্ত করে রাখেন তবে নিঃসন্দেহে তরবীয়তের বহু সমস্যার সমাধান হয়ে যায় যে সমস্ত পিতা-মাতার সর্বদা এই অভিযোগ থাকে। আজকাল মাতা-পিতাগণ বাচ্চাদের এজন্য যে তারা যেন চিৎকার-চেঁচামেচি না করে তাই হয় তাদেরকে পৃথকস্থানে বসিয়ে দেয় বা তাদের হাতে 'আই প্যাড' ধরিয়ে দেন অথবা কম্পিউটারের সামনে বসিয়ে দেন বা টি.ভি-তে বসিয়ে দেন আর সেখানে যদি কোন ভাল কাহিনী প্রসারিত হয় তো ঠিক আছে নতুবা প্রায়শই কেবল সময়ই নষ্ট হতে দেখা যায় এবং ছোট বাচ্চাদের তো কখনোই এভাবে বসানো উচিৎ নয় কারণ এক তো তাদের দৃষ্টি শক্তিকে দুর্বল করে যদি দীর্ঘ সময়ের জন্য বসে থাকে দ্বিতীয়তঃ দুই বছরের নিম্নের শিশুদের তো ডাক্তার বলে থাকে যে তাদের চিন্তাধারায় পার্থক্য পড়তে শুরু করে আবার সে এক দিকে ব্যস্ত হয়ে পড়ে কখনো কখনো মন্দ প্রভাব পড়তে শুরু করে। তাই যাইহোক, হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন যে,- যেভাবে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) আমাদেরকে গল্প শোনাতেন, কাহিনী শোনানোর যে উপকার ঐ সময়ই তার মাধ্যমে অর্জন হোত। যদি সে সময় তিনি আমাদেরকে গল্প-কাহিনী না শোনাতেন তবে আমরা ঐ সময়ে চিৎকার-চেঁচামেচি করতাম আর তিনি কোন কাজ করতে পারতেন না। তাই এটিও প্রয়োজনীয় যে আমাদেরকে কাহিনী শুনিয়ে চুপ করানো হোত এবং এই কারণে প্রতিদিন

রাত্রে আমাদের কৌতুহল-আগ্রহকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে যখনই তিনি কর্ম হতে মুক্ত হতেন কাহিনী শোনাতেন যাতে আমরা ঘুমিয়ে পড়ি এবং তিনি কাজ করতে পারেন, এখন কিছু এমন সরঞ্জাম এসে গেছে যে কারণে পিতা-মাতা একপ্রকার তরবীয়তের জন্য প্ররিশ্রম করতে চান না দ্বিতীয় তাদের সহিত বাচ্চাদের সম্পর্কও কমে যাচ্ছে। তাই এদিকে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক।

এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে যে বন্ধুত্ব এমন হওয়া উচিৎ যা কোন ক্ষতির কারণ হয়ে না দাঁড়ায় হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) একটি ঘটনা বলেন যে,- হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলতেন যে,- এটি একটি পুরাতন কাহিনী। এক ব্যক্তি এবং এক ভল্লুকের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। সে তাকে প্রতিপালন করতো অথবা কোন এক দুঃসময়ে সে তাকে উদ্ধার করেছিল সে জন্য সেই ভল্লুক সেই ব্যক্তির নিকট সর্বদা বসে থাকতো, অথবা এটি একটি কল্প-কাহিনী মাত্র যা কিনা বাস্তবতাকে দর্শানোর জন্য এভাবে কাহিনীরূপে তৈরী করা হয়েছে যদিও এমনটি হয়ে থাকে যে মানুষ ভল্লুক ইত্যাদি জীব-জন্তুকে গৃহপালিত হিসাবে নিজেদের সাথে সম্পৃক্ত গণ্য করে থাকে কিন্তু যখন আমি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) হতে কোন বাস্তবসম্মত তথ্য বা ঘটনা শুনতাম তখন তার এটিই অর্থ দাঁড়াত যে এটি বাস্তবতা উপস্থাপন করার নিমিত্তে একটি কল্প-কাহিনী মাত্র অর্থাৎ কোন উপদেশ দানের জন্য একটি গল্প মাত্র। যাইহোক ভল্লুকটি সেই ব্যক্তির বন্ধুতুল্য ছিল এবং তার নিকট আসতো। একদিন সেই ব্যক্তির মা অসুস্থ শায়িত ছিল এবং সেই ব্যক্তিটি পার্শ্বে উপবিষ্ট পাখা নাড়িয়ে নাড়িয়ে মাছি উড়াচ্ছিল। হঠাৎ কোন প্রয়োজনে তাকে বাহিরে যেতে হলো আর সে সেই ভল্লুককে ইঙ্গিতে জানালো যে তুমি এখানে বসে মাছি তাড়াও আমি ক্ষণিকের জন্য বাহির হতে আসছি। ভল্লুকটি বড়ই নিষ্ঠার সহিত সেই কাজে লেগে তো গেল কিন্তু মানুষ এবং পশুর কাজে পার্থক্য তো থেকেই যায়, এবং পশু অনায়াসে বা সহজে হাত নাড়তে পারে না যত সহজে মানুষ তা পারে। সে মাছি উড়ায় আবার মাছি এসে বসে, পুনরায় মাছি উড়ায় আবার এসে বসে। সে মনে মনে চিন্তা করল যে এভাবে বারংবার মাছির এসে বসা আমার বন্ধুর মায়ের উপর অস্বস্থিকর ব্যাপার হতে পারে। সুতরাং তার অবসান করতে গিয়ে সে একটি বিরাট আকৃতির পাথর উঠায় আর মেরে বসে যাতে মাছিটি মারা যায়। মাছিটি তো মারা যায়, সাথে সেই ব্যক্তির মাও নিষ্পেশিত হয়। এটি একটি উদাহরণ যার অর্থ হোল যে কিছু অবুঝ লোকেরা কারুর সহিত বন্ধুত্ব তো করে কিন্তু বন্ধুত্বের গূঢ় তত্ত বা রীতি তারা জানে না। তারা কখনো কখনো মঙ্গলকামনা করতে চায় পরন্তু ফলতঃ ধ্বংস ডেকে আনে।

অতএব বন্ধুত্ব যেখানে আল্লাহতাআলার নৈকট্য দান করে, বন্ধুদের উপকার সাধন করে সেখানে ধ্বংস ও বিনাশকারীও হয়ে থাকে এবং নিজের ও বন্ধুর উভয় পক্ষের হয়ে থাকে। তাই সে হিসাবে সর্বদা বন্ধুত্বের মূল্যপ্রদান করতে গিয়ে বুদ্ধিকে কাজে লাগানো উচিৎ ও আবেগ-অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিৎ। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন যে,- আমার স্মরণ আছে যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) শোনাতেন যে, কোনও এক ব্যক্তি ছিল যার বন্ধুত্ব এক ভল্লুকের সহিত হয়ে যায় এবং তার স্ত্রী তাকে এই বলে তাচ্ছিল্যস্বরে অপমান করতো যে, তুমি কি কোন মানুষ? তোমার তো ভল্লুকের সাথে বন্ধুত্ব। একদিন তার এরূপ হৃদয়বিদীর্ণকারী কথোপকথন এতই সীমা ছাড়ায় এবং এমন উচ্চকণ্ঠে তা বলা আরম্ভ করলো যে তার বন্ধু ভল্লুক তা শুনে ফেলে। সে তখন একটি তরবারি উঠায় আর নিজ বন্ধুকে বলে এটি আমার মস্তকে মার। এই কথায় মোটেও হতবাক হওয়ার কথা নয় এটি একটি কল্পকাহিনীমাত্র এটি বুঝানোর জন্য যে কোনও মানুষ ভল্লুকের চেহারার হতে পারে এবং আবার কেউ মানুষের চেহারার। প্রত্যেকের স্বভাব ভিন্ন হয়ে থাকে কখনো কখনো মানুষের মধ্যেও ভল্লুক প্রকৃতির মানুষ হয় যারা মানুষ হয়েও পশুসুলভ আচরণ করে বেড়ায়। সেই ব্যক্তিটি এড়াতে চেষ্টা করলেও ভল্লুকটি তার মাথায় মারতে বাধ্য করলো এবং ভল্লুকটি রক্তাক্ত অবস্থায় জঙ্গলের দিকে চলে গেল। এক বছর পর পুনরায় তার বন্ধুর নিকট সেই ভল্লুকটি এল এবং বলল, আমাকে ভালরূপ দেখ, কোন আঘাতের চিহ্ন আছে কি? সে দেখল সত্যিকারের কোন রূপ ক্ষতচিহ্ন ছিল না সেই ভল্লুকের মাথায়। তখন সেই ভল্লুকটি বলল যে,- জঙ্গলে কিছু জড়ি-বুটি হয় সেগুলি দিয়ে আমি চিকিৎসা করি আর ভাল হয়ে যাই কিন্তু তোমার স্ত্রী যে কথা আমার বিরুদ্ধে বলত তার ক্ষতচিহ্ন আজও আমার হৃদয়ে সতেজ বিদ্যমান। তাই কখনো কখনো মুখনিঃসৃত কথা তরবারি দ্বারা সৃষ্ট ক্ষত হতে অধিক তীব্র হয় এবং এই ভাষাগত তরবারি এমন ক্ষত বা আঘাত হানে যা কখনো বিস্মৃত হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং পরিবেশের বা সমাজের শান্তি আনয়নে স্বস্তি আনয়নে এ কথাটি প্রত্যেকের স্মরণ রাখা উচিৎ যে একে অপরের অনুভবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে এবং অযথা এরূপ ভাষার তীর না চালিত করেন যা সর্বদা সতেজ থাকে আঘাতের উপর এবং এটি এমন পাঠ যেটিকে প্রত্যেক আহমদীর স্মরণ রাখা উচিৎ।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)কে মানার পর নিজ ঈমানের সংরক্ষণ প্রত্যেক আহমদীর কর্তব্য এবং কতকবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ই থাকে যা ঈমানকে নষ্ট করে দেয়, কতক সময় আল্লাহতাআলার ইচ্ছার পরিপন্থী কথা বলা হলে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। তাই সর্বদা নিজেদের আত্মজিজ্ঞাসায় লেগে থাকা উচিৎ।

জিকরে এলাহীর বা আল্লাহর বন্দনা সম্পর্কে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর প্রেক্ষাপটে মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন যে,- হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) কোন এক বুজুর্গ এর প্রবচন শোনাতেন যে, দাস্ত দরকারও দিলবা ইয়ার। অর্থাৎ মানুষের হাত সর্বদা কর্মরত থাকা উচিৎ কিন্তু তার হৃদয় সর্বদা আল্লাহতাআলার স্মরণে রত থাকা চাই। এরূপে আরেক পুণ্যবান ব্যক্তি সম্পর্কে যিনি এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ ছিল যে তাকে কেউ জিজ্ঞাসা করলো যে আমি দিনে

কতবার আল্লাহতাআলার জিকর বা স্মরণ করবো? তিনি বলেন যে,- প্রিয়তমের নামকে স্মরণ করবো তা আবার গুণে গুণে? তাই প্রকৃত স্মরণ সেটিই যা অগৌন্তিক হোক কিন্তু একটি বিশেষ সময় নির্দিষ্ট করলে একটি বিশেষত্ব এটি যে মানুষ সেই সময়ে নিজ প্রিয়তমের জন্য এবং কর্ম হতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্মরণ করা হয়। এবং যেহেতু এই দুই প্রকার পরিস্থিতি প্রয়োজনীয় এজন্য প্রকৃত পদ্ধতি হোল এই যে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতেও খোদার বন্দনা করা উচিৎ এবং আজকাল পার্থিবতায় বিলিন মানুষ এসবকিছু বোঝে না তাই তাদের উচিৎ কোনওভাবে সময় নির্দিষ্ট করা এবং অনির্দিষ্টভাবেও উঠতে বসতে আল্লাহতাআলাকে স্মরণ করা উচিৎ এবং তাঁর কৃপাবলীকে এবং অনুগ্রহরাজিকে বারংবার স্মরণ রাখা উচিৎ। ধর্মীয় কথাগুলিকে মনোযোগ সহকারে শোনাই নয় বরং সেগুলিকে স্মরণ রাখার চেষ্টা করা এবং তার উপর আমল বা কার্যকরী করা এক আহমদীর বিশেষ দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত। খুতবাগুলিকে শ্রবণ করা, বক্তৃতাগুলিকে শ্রবণ করা, ইজলাস বা অধিবেশনগুলিতে অংশগ্রহণ করা অথবা ক্ষণকালের জন্য কোন পুস্তককে পাঠ করে নেওয়া এবং তার মাধ্যমে ক্ষণকালের জন্য প্রভাবিত হওয়া সেটিকে স্মরণ না রাখা বা কার্যকরী না করা এসবকিছু কোন উপকার দেয় না মানুষকে। আবার হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর রচনাবলী আছে সেগুলিকে পাঠ করা এবং তা হতে উপকৃত হওয়াও জামাতের গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যগুলির একটি কিন্তু মনে রেখ কেবল মাত্র স্বাদ অর্জনের জন্য তুমি এরূপ কোর না বরং উপকৃত হওয়া ও তার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে তোমরা এ বিষয়গুলির প্রতি মনোনিবেশ করো। তোমরা স্বাদ গ্রহণের জন্য কোরআন পাঠ করো তো তোমরা মোটেও উপকৃত হবে না কিন্তু যদি আল্লাহতাআলার গুণাবলীর উপর দৃষ্টিপ্রদান করতঃ তাঁর ভালবাসার তাড়নায় একবারও যদি সুবহানাল্লাহ বলো তা তোমাকে কোথা হতে কোথায় পৌঁছে দেবে। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)একবার এক সভায় বলেন যে,- কখনো আমরা তসবীহ বা বন্দনা করে থাকি তখন একবারের তসবীহ কোথা হতে কোথা পৌঁছে দেয়। আমি সেই সভায় উপস্থিত ছিলাম না। এক যুবক এই কথাটি শোনে আর সেখান হতে উঠে আমার নিকট আসে এবং বলে যে, এ সংবাদটি জানো কি? যে আজ হযরত সাহেব কি বলেছেন? সেই ব্যক্তি অভিজ্ঞ ছিলেন না কিন্তু আমি স্বল্প বয়সেও অভিজ্ঞতা রাখতাম। তার সারা সারা দিন সুবহানাল্লাহ পাঠ করে কিছুই লাভ হোত না কিন্তু আমি নিজ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বলে জানতাম যে কয়েকবার এমনটি হয়েছে যে যখন আমি সুবহানাল্লাহ বললাম তখন এমন আধ্যাত্মিক অনুভূতি হোল যে আমি পূর্বে যা ছিলাম পাঠের পর ভিন্ন হয়ে গেলাম। দেখো! রসূল করীম (সাঃ)ও এই বিষয়টিকে কিরূপ উৎকর্ষের সহিত বর্ণনা করেছেন অথচ আমি সেই সময় পর্যন্ত বোখারী শরীফ পাঠ করিনি কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা যথার্থ ছিল। রসূল করীম (সাঃ) বলেন যে,- দুটি শব্দ এমন আছে যা রহমান খোদার ভীষণ প্রিয়। জিহ্বা দ্বারা উচ্চারণ করা তা খুবই সহজ। মানুষ এই শব্দগুলিকে বড়ই সহজভাবে নিঃসৃত করতে পারে কোনও প্রকার বোঝা অনুভব হয় না। কিন্তু বিচারদিবসের দিন যখন কর্মের ওজনের প্রশ্ন উঠবে তখন এটি বড়ই ভারী প্রমাণিত হবে এবং যে পাল্লায় সে থাকবে তাকে সম্পূর্ণরূপে ঝুলিয়ে দেবে এবং তা কি সেটি হোল سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم- 'সুবহানাল্লাহ ওয়া বেহামদেহি সুবহানাল্লাহিল আজিম' বলেন যে,- আমায় এই শব্দগুলি পড়ার ভীষণ অভ্যাস আছে এবং আমি দেখেছি যে কখনো একবারই এই বাক্যটি পড়লে আমার আত্মা উর্দ্ধোলোকে পৌঁছে যায়।

যাইহোক আসল কথা হোল আমরা গম্ভীরভাবে আল্লাহতাআলার নির্দেশগুলির উপর দৃষ্টিপাত করি এবং সেগুলিকে অবলম্বন করে জীবননির্বাহ করার চেষ্টা করি। সুতরাং এটিই বাস্তবসত্য যে কোনও কোনও সময় হৃদয় হতে আল্লাহতাআলাকে স্মরণ করা হয় ও আল্লাহতাআলার গুণগান করা হয় এমনটি মনে হয় যে তার সুগভির প্রভাব পড়ছে। এটিই অনুভব হয়। আল্লাহতাআলা আমাদের সকলকে সৌভাগ্য দান করুন যে যেখানে আমাদের মাঝে কর্মশক্তি বলিয়ান করবেন এবং খোদাতাআলার সন্তুষ্টি অর্জনকারী করবেন সেখানে আমরা যেন এমনভাবে তসবীহ ও তহমীদ পাঠকারী হতে পারি যে আমাদের আত্মাকে উচ্চমার্গে পৌঁছে দেয় ও আমাদের খোদাতাআলার নৈকট্যলাভ হতে পারে।

অনুবাদকঃ বুশরা হামীদ, নাজারাত নাশরো ইশাআতের নির্দেশক্রমে

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar 29th January, 2016

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To.....

.....

.....

NAZARAT NASHR-O-ISHAAT, QADIAN, INDIA